Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 65-74
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.049

‘অশ্বচরিত’: ম্যাজিক রিয়ালিজম বনাম ‘চরৈবেতি’

ড. সিদ্ধেশ্বর ব্যানার্জী, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 23.01.2026; Accepted: 31.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Modern Bengali Novel is now opened in many horizons. Especially the novelists of Seventieth Decade of Twentieth Century have tried to depict the oppressed people with their own reality. So, in many times, novelists have chosen the magic realistic genre to fulfil the purpose. Amar Mitra, as a writer, always tries to bring the soil-oriented people of West Bengal. He also tries to focus the Indian traditional culture. In his novel ‘Aswacharit’, there are many elements included which are technically the perspectives of Magic-realism. But, simultaneously, in the very ground, the ‘Mantra’ of ‘Charoibeti’ {Go ahead} is implied in this novel. I have tried to reveal this inner message, which is not of a certain time, but forever.

Keywords: Magic-Realism, Amar Mitra, Aswacharit, Indian Philosophy, Synthesis

এক

“‘ব্যক্তি’ ডুবে যায় ‘দলে’ মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে-বা মনে রাখে?”[১]

‘ছাত্রধারা’ কবিতায় কালিদাস রায় বর্ষে বর্ষে দলে দলে আগত ছাত্রদের সম্পর্কে একথা বলেছিলেন। কোনও একজন শিল্পী সম্পর্কে আলোচনাসূত্রেও এই ভাবনাটি প্রাসঙ্গিক। প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকের শুধুমাত্র একটি সৃজন সম্পর্কে সমালোচনা করা খুবই মুশকিলের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে খণ্ডিত দর্শনের দোষ থেকে যেতে পারে। কিন্তু একজন শিক্ষক যেমন তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ছাত্রদের মনে রেখে দিতে পারেন বা বলা ভালো স্বাভাবিকভাবেই মনে থেকে যায়; তেমনই একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকের কোনও একটি সৃজন তাঁর সামগ্রিক শিল্পী বা সাহিত্যিক সত্ত্বার কেন্দ্রীভূত রূপপ্রকাশ হয়ে ওঠে। আমাদের এই প্রবন্ধে আলোচনার জন্য আমরা বেছে নিয়েছি অমর মিত্রের ‘অশ্বচরিত’ উপন্যাসটি।

‘অশ্বচরিত’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালের কলকাতা বইমেলায়। তবে এই উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল ১৯৮২ সালে লিখিত এবং ‘শিলাদিত্য’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘বিভ্রম’ নামক উপন্যাসের মধ্যে। ১৯৯৫ সালে ‘বারোমাস’ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘চাঁদবালি’ গল্পের মধ্যেও ‘অশ্বচরিত’ উপন্যাসের আর এক প্রস্তুতি দেখা যায়।

তাত্ত্বিক পরিসরে ফেলে সাহিত্য বিচারের পদ্ধতি প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এটিও ভাবনার বিষয় কোনও ‘বাদ’-ই কি সার্বিকভাবে একটি সাহিত্যিক উপাদানকে মূল্যায়ন করতে সক্ষম? আবার অন্যভাবে ভাবলে, কোনও সাহিত্যিক কি কোনও নির্দিষ্ট মতবাদের সাপেক্ষে সাহিত্য সৃজন বা নির্মাণ করতে পারেন? তবু আস্বাদনের নানান মাত্রায় লেখক-পাঠক-সমালোচক এগিয়ে চলেন। চলতেই হয়। কারণ উন্মাদনা যাঁদের

রক্তে, মননে তাঁরা সবকিছু সময় বা নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে নির্বিকার অচল হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অবলম্বন অমর মিত্রের 'অশ্বচরিত' উপন্যাস। এই উপন্যাস আস্বাদনের জন্য আমরা ম্যাজিক রিয়ালিজম কী বা কেন এবং কীভাবে তা যেমন দেখে নিতে চাইব তেমনই আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির সাপেক্ষেও উপন্যাসটির বিচারে প্রয়াসী হব। শেষ অব্দি আমরা হয়তো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি; যে সিদ্ধান্ত সমন্বয়ের কথা বলে, বলে সংশ্লেষের কথা, চিরন্তন মানবতার কথা।

দুই

ইমপ্রেশনইজম, এক্সপ্রেশনইজম, ডাডাইজম ও সুররিয়ালিজমের আবহেই ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রসার। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান শিল্প-সমালোচক Franj Roh (১৮৯০-১৯৬৫) Max Beckmann, George Grosz এবং Otto Dix আয়োজিত এক প্রদর্শনীর আলোচনায় নতুন ধরনের কিছু post-expressionist চিত্রকলাকে জাদু-বাস্তব চিত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন। কিন্তু এরও বছর পাঁচেক আগে থেকেই এই মতবাদের চিন্তাসূত্র জন্মে গিয়েছিল রো সাহেবের মনে। নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে ম্যাজিক রিয়ালিজমের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

> "Magical realist texts are subversive: their in-betweenness, their all-at-onceness encourages resistance to monologic political and cultural structures, a feature that has made the mode particularly useful to writer's inpostcolonia land, increasingly, to women. Hallucinatory scenes and events, fantastic/ phantasmagoric characters are used in several of the magical realist work discussed here to indicate recent political and cultural perversions."[২]

পরের পরিচ্ছেদে আমরা জাদুবাস্তবতার বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে 'অশ্বচরিত' উপন্যাসটির বিশ্লেষণের সময়ই এই আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যগুলি সবিস্তারে আলোচনা করবো।

রো'র উল্লেখযোগ্য প্রভাব প্রথম দেখা যায় ইতালিয়ান লেখক Massimo Bontempelli (1878-1960)-এর উপর। তিনি ফ্যাসিস্ট শক্তির কবল থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে ব্যবহার করলেন ম্যাজিক রিয়াযযলিজমের আঙ্গিক, রচনা করলেন 'Novecento' (1926)। এজন্যই রবার্ট ডোমব্রস্কি তাঁকে অভিহিত করেছেন 'the first magic realist creative writer'[৩] হিসেবে। ডোমব্রস্কির মতে, বোনটেমপেল্লি বাস্তবকে তুলে ধরেছেন পুরাণ ও জাদুর অদ্ভুত চমৎকারিত্বে; 'opening new mythical and magical perspectives on reality'[৪] ।

জাদুবাস্তব সাহিত্য সর্বাধিক বিকশিত হয় মার্কেজের হাত ধরে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে মার্কেজ তাঁর "One Hundred Years of Solitude" গ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ভাষণে মার্কেজ জাদুবাস্তবতার স্বরূপ ও সম্ভাবনা সম্পর্কে নানান কথা তুলে ধরেন। এরপর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকরা জাদুবাস্তবতাকে ব্যবহার করেন উপন্যাস রচনার আঙ্গিক হিসেবে। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যও পিছিয়ে থাকে নি।

ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় ম্যাজিক রিয়ালিজমের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি সামাজিক অনাচারের নানা দিককে কল্পকথার মাধ্যমে প্রতিবাদের মুখে দাঁড় করিয়েছিলেন। এরপর ছয়ের দশকে খুব সচেতনভাবে ম্যাজিক রিয়ালিজম বা জাদু-বাস্তবতার প্রারম্ভিক খসড়া নির্মিত হতে দেখা যায় মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয়আশয়' (১৯৬৭), 'হাওয়া গাড়ি' (১৯৭৯), 'চন্দনেশ্বর জংশন' (১৯৮০), 'হিম পড়ে গেল' (১৯৮২) ইত্যাদি

উপন্যাসে ম্যাজিক রিয়ালিজমের নানান উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। অভিজিৎ সেন 'দেবাংশী' (১৯৮১), 'রহু চণ্ডালের হাড়' (১৯৮৫), 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' ইত্যাদি উপন্যাসের আখ্যানের প্রচলিত রীতিনীতি ত্যাগ করে পৌঁছে যান জাদুবাস্তবতার মায়াবী লোকে। বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের হয়ে কথা বলেন ভিন্ন আঙ্গিক ও ভাষায়। ১৯৮৭-তে প্রকাশিত 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী ম্যাজিক রিয়ালিজমের এক সুচারু বয়ান উপস্থাপন করেন। জাদু-বাস্তবতার মাধ্যমে উপস্থাপিত নিম্নবর্গীয় সমাজের রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধার আর এক সার্থক নির্মাণ মহাশ্বেতার 'চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর' (১৯৮২)। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' (১৯৮৮), আবুল বাশারের 'মরুস্বর্গ' (১৯৯১) উপন্যাসেও জাদুবাস্তবতার আলম্বন দেখা যায়। রবিশংকর বল, সোহারাব হোসেন, নবারুণ ভট্টাচার্য প্রমুখের একাধিক উপন্যাসের মধ্যে জাদুবাস্তবতার মায়ালোক নির্মিত হয়েছে। সেই ধারায় অমর মিত্রের অবস্থান খুবই বলিষ্ঠ বলেই আমাদের মনে হয়। আমরা অবশ্য তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যিক সত্তার সাপেক্ষে ম্যাজিক রিয়ালিজমের আলোচনা করবো না। আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে কেবল তাঁর 'অশ্বচরিত' উপন্যাসের মধ্যেই।

তিন

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকাঠামোকে খুব জোরের সঙ্গে প্রতিহত করাই ম্যাজিক রিয়ালিস্টিক বয়ানের মূল লক্ষ্য। অমর মিত্রের 'অশ্বচরিত' আপাতভাবে একটি ঘোড়ার জীবনকথা মনে হতে পারে। কিন্তু তা নয়। সামগ্রিক পাঠে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মায় যে, লেখকের অভিপ্রায় খুবই ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। সুরেন কুণ্ডুর কথার প্রেক্ষিতে ভানু দাস যখন ভাবে,

> "ভগবান কী দিয়ে গড়ে এইসব? কোন মায়া, কোন কুহক জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে, যে বারবার মানুষ ছুটে যায়! নদী না দেখলে, সমুদ্র না দেখলে, পাহাড়, জঙ্গল না দেখলে মানুষের চলে না। কেন চলে না? অথচ সেই নদী পাহাড়, সমুদ্র উপকূল নষ্ট করতে মানুষের কত উৎসাহ।"[৫]

তখন আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না, এই ভাবনা শুধু ঘোড়াওয়ালা ভানু দাসের একক ভাবনা নয়; এই ভাবনা অসহায় লেখকের, অসহায় পাঠকের এবং বিধ্বস্ত সময়ের। আবার, ধর্ষিত, স্বামী-পরিত্যক্ত সুভদ্রা যখন বলে, "দেশের কাজটা কী ভানুবাবু, মোরে নষ্ট করা?"[৬] তখন সুভদ্রার এই উচ্চারণ ভানু দাসের কাছে হলেও তা উপন্যাসের বয়ানের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা থাকে পুলিশ-আমলা নির্ভর নির্মম সরকারের কাছে। চা-দোকানি সুরেন কুণ্ডুর কণ্ঠেও ফুটে ওঠে প্রতিবাদের বয়ান:

> "ভালো লাগে না, বিক্রিবাটা নেই, জিনিসপত্তর আগুন, তার উপর এই যে আলো কুম্পানি, থাম্মাল পাওয়ার কাঁঠালবেড়ে ধ্বংস করে দিল, শোনা যাচ্ছে রাস্তার এপারও নেবে, এই দোকানটাও তুলে দেবে।"[৭]

সরকারের বিভিন্ন আইন ও প্রকল্পের চাপে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন তছনছ হয়ে যায়। সরকারী প্রকল্পের বাস্তব রূপায়নের যেমন প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে তেমনই নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষদের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা যে রয়েছে তা ভুলে গেলে কী করে চলবে? উপন্যাসের পরতে পরতে একথা বারবার কাহিনীকার বলতে চেয়েছেন নানান চরিত্রের মাধ্যমে, ঘটনার মাধ্যমে। যথা:

> "ফ্যামিলি সিলিং আইন সব জমি খাস করে দিচ্ছে। দেশ থেকে যদি জমির মালিক চলে যায়, তবে সে দেশের থাকে কী? মান-সম্মান সবই তো জমি দেয়। জমিই টাকা দেয়। হোটেল দিয়েছে শ্রীপতি মাইতিকে। জমি যত ইচ্ছে ফুর্তি দেয়। শ্রীপতি ইচ্ছে করলেই তার চাষবাড়িতে মেয়েমানুষ রাখতে পারে।"[৮]

ম্যাজিক রিয়ালিজমের দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটে ক্ষমতা ও পরাক্রমের বিপরীতে থাকে প্রান্তিক জনসমাজ, যাঁদের বেঁচে থাকার মূল অবলম্বন নিজস্ব সংস্কৃতি, মিথ আর লোককথা। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসে বেশিরভাগ চরিত্রই প্রান্তিক শ্রেণির। ভানু দাস থেকে শুরু করে গৌরমোহন-কোকিলা, শিবরাম, অবনী মৃধা, চা-দোকানি সুরেন কুণ্ডু, রামচন্দ্র-সুভদ্রা, পঞ্চম ঠাকুর-ঠাকুরাণী, অনন্ত-সরস্বতী-কুন্তী– এদের সবার জীবন ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির হাতে কেবল দুমড়েমুচড়ে যায়। হোটেল মালিক শ্রীপতি মাইতি ঠিক অত্যাচারী নয়, কিন্তু সরকার ও আমলাদের চাপে শাসকশ্রেণির সহায়ক হয়ে উঠতে বাধ্য হয়।

উদ্ভট ও অবিশ্বাস্য উপাদানের প্রাচুর্য দেখা যায় ম্যাজিক রিয়ালিজমের ন্যারেশনে। এপ্রসঙ্গে Charis Baldick-এর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য:

> "a kind of modern fiction in which fabulous and fantastical events are included in a narrative that otherwise maintains a 'reliable' tone of objective realistic report"[৯]

'অশ্বচরিত' উপন্যাসেও আমরা অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য নানান বিষয়ের অবতারণা দেখতে পাই। প্রথমত ভানু দাস চরিত্রটিই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য। উপন্যাসের শুরুই হয় ভানু দাসের সেই অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা দিয়ে:

> "ভানুচরণ মানুষটি বড় অদ্ভুত। আসতে আসতে কী মনে হলো ভেড়িবাঁধ থেকে নেমে ঝাউবনের দিকে চলে গেল, যেন ঝাউবনে তাঁর কন্থক রয়েছে। ছিল পক্ষিরাজ, হয়ে গেল কন্থক। ছিল ভানুচরণ, ভানু দাস হয়ে গেল ছন্দক। ঘোড়া হারিয়ে আরো উদাস হয়ে গেছে। না হলে ঘোড়াটাকে খুঁজতে বেরিয়ে আপন মনে অন্য দিকে চলে যায়! বলে কিনা, ওই দিকে যাই, আপনি বাবু দেখে আসুন লায়কানখাস। ..."[১০]

ভানু দাস হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া খুঁজেই কাটিয়ে চলে তার জীবন। আর এক অদ্ভুত চরিত্রের নাম সতীশ গিরি, নগেন গিরিমশায়ের ছেলে। যুদ্ধের উন্মাদনা খুঁজে পেতে গিয়ে নিজের ঘরের ঘুড়ীকেই বিষ দিয়ে মেরে ফেলে; ভাবে সত্য সত্যই ঘোড়ার ডানা গজাবে।

> "আমার সন্দেহ হচ্ছে ঘোটনের ডানা দুটা যে কোন দিন বার হঁই যাবে, ডানা ফুটি যাবে, তারপর আর উয়াকে রাখা যাবেনি, উ আর রহিবেনি ই পৃথিবীতে, সাগর পার হঁই যাবে।"[১১]

অবিশ্বাস্য নানা ঘটনার আবহ এই উপন্যাসের বহু জায়গাতেই দেখা যায়। আরও দু-একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে:

- "ভানু স্পষ্ট দেখতে পায় পক্ষিরাজের চোখে জল। ঘোড়াটা কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে ডুবে যায়। জলের ভিতরে ডুবেও কাঁদে। চোখের জল গড়িয়ে সাপের মতো হয়ে যায়। চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে কতদূর চলে যায়।"[১২]
- "কোকিলা নয়, এ যেন মেঘের ছায়া। নাকি মেঘ? মেঘ না হলে গায়ের রঙ এমন মেঘের মত হয়! বাতাসে চুল উড়ছে। এমন উড়ছে যেন কোকিলাকে নিয়ে ওই চুল আকাশে উড়ে যাবে। শ্রীপতির মনে হলো কোকিলা বধূ, গৌরমোহনের বউ আর যেন মাটিতে থাকবে না।"[১৩]
- "ভানু হালকা অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার পিঠটা ছুঁয়ে ফেলতেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল। এ যে সেই ঘোড়া, একেবারে সেই রকম! ছদ্মবেশে লুকিয়েছে গিরিমশায়ের বাড়ি, বয়সও লুকিয়েছে মনে হয়।"[১৪]

- "ভারতীর মাথার ভিতর শিমুল ফুল, ফেটে ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়ছিল। খুব কোমল শাদা শিমুল তুলো। লাল লাল ফুল– বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে তুলো উড়ে যাচ্ছে আকাশময়।"[১৫]

জাদুবাস্তবতা বাস্তববাদের কালানুক্রমিকতাকে ভেঙে দেয়। মিথিক সেন্স অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় প্রচলিত সময়গত ধারণা তছনছ হয়ে যায়।

> "Time is poised in a luminal space and in a between time, which having broken out of the binary opposition between circular and linear, gives a third space and a different time the chance to emerge"[১৬]

'অশ্বচরিত' উপন্যাসেও সময়ের সাধারণ ধারণা এলোমেলো হয়ে যায়। সাধারণ পাঠক অসতর্ক থাকলে, অদীক্ষিত থাকলে এই উপন্যাসের সময়ের নির্মাণকে ধরতেই পারবেন না। বেশ কয়েকটি উদাহরণের সাপেক্ষে তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা করলাম:

- "ভানুর চোখ দিয়ে আচমকা জল গড়াতে থাকে। মনে পড়ে শাক্যসিংহ অবতরণ করলেন অশ্ব থেকে। শাক্য সিংহ তাদের বিসর্জন দিয়ে প্রবেশ করলেন বনমধ্যে। শূন্যপৃষ্ঠ কন্থকের চোখে জল। ছন্দকের চোখে জল। ভালবাসার বড় টান! তুই আমার কেউ না, তবু তুই-ই আমার সব। আয়, ফিরে আয় কন্থক। রাজপুত্র তো রেখে গেছে আমাদের। যত দিন, যত যুগ, যত সহস্র বছর যায় যাক, আমি তোকে নিয়ে থাকব, তুই আমাকে নিয়ে থাকবি। ঘোড়া না থাকলে ঘোড়াওয়ালা ভানু দাস কে? ঘোড়ার দেখাশুনোই যখন হবে না, এ পৃথিবীতে ছন্দকের কাজটা কী?"[১৭]
- "না বাবু, আমি অন্ধকারে একা একা কত সমুদ্দুরের ধারে শুয়ে থেকেছি, চাঁদবালি, দে-পাল, কুসমাড়, মহাপাত্রপুর, মেরিনা বিচ, ওয়ালটেয়ারের সমুদ্দুর, মীরগোদার সমুদ্দুর, আপনি যদি বলেন, জাভা, বালিদ্বীপ, ওইসব দেশের সমুদ্দুরের ধারে শুয়ে থেকেছি অন্ধকারে, চাঁদ যখন আলো ফেলেছে মুখে, জেগে উঠেছি আমি ছন্দক, আবার পূর্ণিমার সমস্ত রাতে গড়াগড়ি খেয়েছি বালির উপর..."[১৮]

যখন সুরেন কুণ্ডু বলে "বললাম তো ভগবান সরে যাচ্ছে জগত থেকে, তোমার ঘোড়াটা ভগবানই ছিল, ভগবান বুদ্ধর জন্মদিনে সে পালালো।"[১৯] তখন যেন পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে ভানুর। মনে পড়ে কপিলাবস্তু, রাজপুত্র, কন্থকের কথা। কাল পরিবর্তনের কথা ভেবে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। আবার কোকিলার সঙ্গে কথোপকথনকালেও ভানুর মনে হয়:

> "এখন সে মদরঞ্জিওয়ালার বউ, পেটে ভাত, গায়ে কাপড় জোটে না, কিন্তু এমন কি ছিল বহু বহু বর্ষ আগে, সেই রাজ অন্তঃপুরে? রাজদাসী হলেও তো ছিল সেই কুমারের দাসী, ভগবানের পা ধুইয়ে দিত সে, মনে পড়ে তা?"[২০]

এভাবেই জন্ম-জন্মান্তরের প্রসঙ্গে ভানু দাস চলে যায় যখন তখন। এই যাতায়াত আপাতভাবে বাস্তব বলে মনে হয় না; কিন্তু একেবারেই কি উড়িয়ে দেওয়া চলে অবাস্তব বলে? এই আলোআঁধারির অতিবাস্তবিক জগতকেই খুবই সহানুভূতির সঙ্গে কথাকার উপস্থাপন করেছেন নিজস্ব গদ্যভঙ্গিমায়।

প্রতিবাদী মানব চরিত্রের রূপান্তর হতে দেখা যায় ম্যাজিক রিয়ালিসটিক উপন্যাসে। মানুষ রূপান্তরিত হয়ে যায় বিভিন্ন জীবজন্তুতে। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসে এরকম খুব একটা দেখা যায় না। তবে ভানু দাসের ভাবনায় মানুষের এই রূপান্তরণ দেখা যায়। যেমন,

- "কেমনভাবে বসে আছে রামচন্দ্র? ঠিক যেন বাবুর পোষা ঘোড়া। সেই পক্ষিরাজ।"[২১]
- "আরবি যাদুকরী! কিন্তু মেয়েটা যে বড় টানছেরে ভানু, গাছ হই হবো, কিন্তু আমি যে চাই তারে।"[২২]

- "তার চোখ খুঁজছিল একটি শূন্য নৌকাকে। শূন্য নৌকো যেন ফিরে আসবে একা একা, মাঝি তাকে ছেড়ে চলে গেছে। ভানুর মনে হচ্ছিল সে নিজেই যেন সেই শূন্য নৌকোটি।"[২৩]

রামচন্দ্রকে হারিয়ে যাওয়া ঘোড়া ভাবা বা কোকিলা বধূকে আরবি জাদুকরী ধরে নিয়ে যাবে এই মর্মে শ্রীপতিকে ভানুর সাবধান করে দেওয়া সাদা চোখে আজব বলেই মনে হয়।

জাদু-বাস্তবতার অন্যতম অবলম্বন স্বপ্ন। "dream is the irreducible element in magical realism"[২৪] স্বপ্নের মধ্যেই জীবনের অনেক ভাঙাগড়া নির্মিত হয়ে যায়। এখানে অবশ্য খুবই স্বাভাবিক স্বপ্নের কথা বলা হচ্ছে না। আসলে ক্ষমতা-প্রতিপত্তির কাছে হারতে হারতে, বাস্তবের মাটিতে বারবার আছাড় খেতে খেতে কাহিনির চরিত্ররা স্বপ্নের মধ্যেই খুঁজে পায় তাঁদের মুক্তির পরিসর। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসে ভানু দাসকে, শ্রীপতি মাইতিকে আমরা প্রায়শই ডুবে যেতে দেখি স্বপ্নের মধ্যে। তারপর তাঁদের শান্তির এক বাতাবরণে পৌঁছে যাওয়ার লক্ষণ ফুটে ওঠে।

কথোপকথন অলৌকিক বাতাবরণে অভিনব রূপ পায় ম্যাজিক রিয়ালিস্টিক বয়ানে। জীবিত ও মৃত মানুষের কথোপকথন, জড় বস্তুর সঙ্গে মানুষের কথোপকথন, অবলা জীবের সঙ্গে মানুষের কথোপকথন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে ওঠে জাদু-বাস্তবতার জগতে। অমর মিত্রের 'অশ্বচরিত' উপন্যাসে হারিয়ে যাওয়া ঘোড়ার সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনে মেতে ওঠে শ্রীপতি মাইতি বাইশ পরিচ্ছেদে (১২৪-১৩০পৃষ্ঠা)। ভানু দাস তাঁর ভুল ভাঙিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শ্রীপতি মাইতির মনে হয়, ভানু তাঁর সঙ্গে শয়তানি করছে।

ম্যাজিক রিয়ালিজমের নানা বৈশিষ্ট্যের সাপেক্ষে 'অশ্বচরিত' উপন্যাসকে বিচার করাই চলে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম। কিন্তু তারও পরে প্রশ্ন থেকেই যায়। প্রশ্ন হলো, পাশ্চাত্য দেশীয় মতবাদের সাপেক্ষেই কি আমরা এই উপন্যাসের আস্বাদ নেবো? না কি এই উপন্যাসের গভীরে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের শিকড় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে? সেই প্রচেষ্টা থেকেই আমাদের এই প্রবন্ধের পরবর্তী পরিচ্ছেদের বিস্তার।

চার

পুরোপুরি কাল্পনিকতায় ভর করে অমর মিত্র 'অশ্বচরিত' রচনা করেননি। বা বিদেশি তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কষ্টকল্পিত কাহিনির অবতারণা করেননি। ভানু দাস তাঁর চোখে দেখা বাস্তব চরিত্র। সে সম্পর্কে লেখক জানান:

> "আমি কর্মসূত্রে ১৯৮০ সালে একবছর দিঘার সমুদ্র তীরে ছিলাম একটি হোটেলের একটি ঘর সমস্ত বছরের জন্য ভাড়া নিয়ে। ঘোড়াটিকে তখন দেখি। নিরুদ্দিষ্ট ঘোড়াটিকে খুঁজতে আমিও বেরিয়েছি ভানুদাসের সঙ্গে। ভানুদাস লোকটি ছিল ভবঘুরে। আমার হোটেলের বারান্দায় পড়ে থাকতো।"[২৫]

অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি আমদানি করা কাহিনি নয়। এই কাহিনি নিজের মাটির কাহিনি। 'উৎসর্গপত্রে'র আগের পাতায় কথাকার অমর মিত্র উদ্ধৃত করেছেন অশ্বঘোষ প্রণীত 'বুদ্ধচরিত'-এর অষ্টম সর্গের চতুর্দশ শ্লোক:

> "পুনঃ কুমারো বিনিবৃত্য ইত্যথো গবাক্ষমালাঃ প্রতিপেদিরেহঙ্গনাঃ।
> বিবিক্ত পৃষ্ঠং চ নিশাম্য বাজিনং পুনর্গবাক্ষাণি পিধায় চুক্রুশুঃ।।"[২৬]

সঙ্গে বঙ্গানুবাদটিও রেখেছেন:

> "পুনরায় কুমার ফিরে এসেছেন, এই ভেবে নারীসকল সমস্ত গবাক্ষদ্বারে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু অশ্বকে শূন্যপৃষ্ঠে ফিরেছে দেখে তাঁরা গবাক্ষ রুদ্ধ করে আবার উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন।"[২৭]

পারিবারিক সাংস্কৃতিক পরিসর সম্পর্কে পাঠক সমালোচক সকলেই অবগত। তাছাড়া, প্রায় সমকালে 'ধ্রুবপুত্র' (২০০২) রচনার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হন কথাকার। সেই সূত্রেই তিনি পড়ে ফেলেন অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'। 'অশ্বচরিত' রচনার প্রত্যক্ষ প্রেষণা পেয়ে যান সময়-সংযোগে। প্রায় ১৫-১৬ বছর আগের 'বিভ্রম' আর বিভ্রম থাকে না। উচ্চারিত হয়:

> "হে কুমার, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমার পায়ের নীচে তপ্ত বালুকা সমুদ্র, মাথার উপরে ধূমাবতী আকাশ, আমার পিছনে হত্যাকারীর দল। হে গৌতম শাক্য সিংহ, এ আমি কোথায় এলাম? আমার যে শুধু তোমার কথা মনে পড়ে, সারথির কথা মনে পড়ে, তুমি কি ভুলে গেছ সব? এই যে আকাশে ফুটত সোনালি রঙের মেঘ, তার নীচে সারথি আর তুমি, হে সারথি ছন্দক!"[২৮]

আমাদের স্মরণ করতেই হয়, ঠিক এই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাপ্রবাহ। ১৯৯৮ সালে বুদ্ধ পূর্ণিমার রাতে পোখরানে পরমাণু বোমার সফল পরীক্ষা এবং তাকে ঘিরে দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের জাতীয়তাবাদ উসকে দেওয়ার চটকদারি প্রয়াস। অনুভূতিপ্রবণ কথাকার অমর মিত্র এই ঘটনার অভিঘাতে খুবই আন্দোলিত হন। সেই আন্দোলনের বাহ্যিক প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশেষত সুভদ্রার অকপট বয়ানে:

> "মাথা নাড়ে সুভদ্রা, জানোয়ারে টের পায় সব, যাবেনি, শুধু মানুষই কুছু বুঝেনি, কত লকে কহিছে যা হঁইছে ভালর তরে হঁইছে, দেশের কাজ হঁইছে বড়।"[২৯]

দেশের উন্নতি কি শুধু পেশিশক্তির আস্ফালনে? সাধারণ জনসমাজের সুখদুঃখের কথা সরকার জানবে না? রামচন্দ্রও গর্জে ওঠে নিজস্ব উপলব্ধির স্পষ্ট উচ্চারণে:

> "দশ হাত! গরগর করে ওঠে রামচন্দ্র, ঠিকাদার, লেবার, পুলিশ মেয়্যামানুষ খুঁজে, উয়াদের থাবায় পড়ি গিইছিল, আর যতন নায়েকের মেয়্যা, হরিহর দঁড়পাটের মেয়্যা, আফুল পয়ড়ার বিধবা বুন, সব বালেশ্বরে গিয়া লাইনে দাঁড়াই গিছে, ইয়া ছাড়া উপায় নি, গলায় দড়ি দিয়া মরিছে সুফল দাশের বউ, ইসব তো বাবুর জানা উচিত।"[৩০]

এই রামচন্দ্র সুভদ্রার আশ্রয়ের জন্য সুরাহার জন্য লড়াই করতে থাকে। কিন্তু সুভদ্রার নিজের স্বামী তার ধর্ষণের বিচার চায়নি। পেশিশক্তির ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে উল্টে সুভদ্রাকেই সতর্ক করে:

> "রাতজাগা পাণ্ডবকুমার তখন হাত চাপা দিল বউ-এর মুখে, চুপ যা, লকে যেন না জানে, মেয়্যামানুষের ইজ্জত গিইছে ইকথা লকে জানলে বড় বিপদ, লকে তুরে দোষ দিবে, ঘর থিকে বাহার যাবিনি।"[৩১]

এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা ভানু দাসকে বারবার বিচলিত করে। এইসব কাটাছেঁড়া মানুষদের জীবনযন্ত্রনা সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে। সে নিজেও প্রবঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি। শিকড় হারানোর যন্ত্রণা সে মর্মে মর্মে জানে। তাই আতঙ্কিত হয় সুভদ্রার পরিণতির কথা ভেবে:

> "যদি কাছারি উঠে যায় আবার আশ্রয় হারাবে সুভদ্রা। যতবার সে আঁকড়ে ধরতে চাইছে মাটি, মাটি তাকে ঠেলে দিচ্ছে। শিকড় উপড়ে দিচ্ছে!"[৩২]

পাণ্ডবকুমার সুভদ্রাকে রক্ষা করতে পারেনি। সেই ভয়ংকর রাতের বর্ণনা একটি বাক্যেই জ্বালামুখী হয়ে ওঠে:

> "হায়! সমস্ত পল্লীটা সেদিন যেন বারবনিতা পল্লীর মতো ভেবে বসেছিল পুলিশ আর ঠিকেদারের লোক।"[৩৩]

এই যে ব্যাভিচার, এই যে অনাচার, এই যে শোষণ, এর কি কোন শেষ নেই? কেন ঘোড়া শ্রীপতির কাছ থেকে পালিয়ে যায় তার স্পষ্ট আভাসও ফুটে ওঠে। ভানু দাসের উপলব্ধি তাই শত প্রশ্নের যেন উত্তরপত্র হয়ে ওঠে।

> "রাজপুত্রের জন্মদিন, পূর্ণিমা, পোখরানের মরুভূমিতে বিস্ফোরণ, ঘোড়ার পালানো– এসবে কি যোগাযোগ আছে?"[৩৪]

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি, ম্যাজিক রিয়ালিজমের মতোই দেশীয় পুরাণের কাছে, দেশীয় বিশ্বাসের কাছে কথাকার ফিরে যেতে চাইছেন। নিচ্ছেন পাশ্চাত্যের আঙ্গিককে। কিন্তু মাতি-সংলগ্ন থেকেই প্রতিবেদনকে বিস্তৃত করছেন। তাই পড়তে গিয়ে আমরা কখনই তত্ত্বের অভাবে দিশেহারা হয়ে যাই না। প্রচলিত কাঠামোর নায়ক যেমন খুঁজি না, তেমনই খুঁজি না প্রচলিত সময়ের ধারণাকে।

পাঁচ

অমর মিত্র বাস্তবের মাটিতেই পা রাখতে ভালোবাসেন। সময়ের অভিঘাতকে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদের ধরন প্রত্যক্ষ বা উচ্চকিত নয়। তিনি কথা বলেন যেমন সহজভাবে তেমনই তাঁর গদ্যের চলনও সহজ। কিন্তু গভীর ভাব প্রকাশের সময় সেই সহজ কথার স্রোতেই অন্তর্লীন থেকে যায় উপলব্ধ দর্শন। বিদেশি সাহিত্য এবং সাহিত্যিক মতবাদ সম্পর্কে তিনি বরাবরই ওয়াকিবহাল। কিন্তু দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি কি তাঁর কোন সংরাগ নেই? তপোধীর ভট্টাচার্য অমর মিত্রকে বলেছেন: "সময়ের নথিরক্ষক।"[৩৫] অমর মিত্র চিরন্তন বা শাশ্বত সময়ের সাপেক্ষেই বর্তমান সময়কে পর্যবেক্ষণ করেন। তাই সুদূর অতীত যেমন তাঁর প্রতিবেদনে উঠে আসে তেমনই অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তায় উদ্বেল হয়ে ওঠে তাঁর প্রতিবেদনের চরিত্রগুলি। তাই নীচের বয়ান যেমন উঠে আসে:

> "এই কি আমার পৃথিবী? নদী, পর্বত, সমুদ্র, মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস! আলোর পৃথিবী কি এই? হে রাজপুত্র, আমাদের বিসর্জন দিয়ে তুমি সর্বস্বত্যাগী হলে। এই পৃথিবী হিংসায় পূর্ণ – দুঃখের সমুদ্র, ব্যাধির ফেনায় বিকীর্ণ, জরার তরঙ্গে উদ্বেল, মৃত্যুর উগ্রতায় ভয়ংকর। তুমি সেই হিংসার পৃথিবীতে রেখে গেছ ছন্দক আর কন্থককে। হে কুমার, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না আমার পায়ের নীচে তপ্ত বালুকা সমুদ্র, মাথার উপরে ধূমাবতী আকাশ, আমার পিছনে হত্যাকারীর দল। হে গৌতম শাক্য সিংহ, এ আমি কোথায় এলাম? আমার যে শুধু তোমার কথা মনে পড়ে, সারথির কথা মনে পড়ে, তুমি কি ভুলে গেছ সব? এই যে আকাশে ফুটত সোনালি রঙের মেঘ, তার নীচে সারথি আর তুমি, হে সারথি ছন্দক!"[৩৬]

তেমনই অন্য বয়ানও আমরা পেয়ে যাই, যার গভীরে থাকে ফুলেফলে ভরা অতীতের সাপেক্ষে প্রাণবন্ত, আলোকময় ভবিষ্যতের সম্ভাবনার ইশারা:

> "অন্ধ ঘোড়াটি হাঁটছিল। বালিতে ডুবে ডুবে মুখ তুলছিল। তার মনে পড়ছিল আশ্বিনের কথা। কাশফুলের কথা। মেঘের কথা। জ্যোৎস্নার কথা। গিরিমশায়ের ঘুড়ীটির কথা। রাত্রি হয়ে এল। আকাশ কালো। একটিও তারা নেই, চাঁদ নেই। কোথাও কোন আলো নেই। শুধু তার মাথার ভিতরে বুদ্ধদেবের মতো প্রেমময় চাঁদ ছিল। আলো ছিল। চাঁদ আর আলোর স্মৃতি ছিল। সমুদ্র ছিল, বাতাস ছিল, সবুজ তৃণভূমি ছিল। ছিল সেই রাজপুত্র যার মাথায়

> মাথায় চলত সোনালি রঙের মেঘ, শ্বেত কবুতর উড়ত যে মেঘে, সেই মেঘের দিনগুলি স্মৃতিতে আছে।"[৩৭]

একারণেই ঘোড়াটি এগিয়ে যাওয়ার সাহস রাখে এখনও, এখনও ভরসা রাখে সময়ের উপর। তাই 'অশ্বচরিত' উপন্যাস শেষ হয় এই বাক্য দিয়ে: "কন্থক মরে যেতে যেতে উঠে দাঁড়াতে চাইছে।"[৩৮] উঠে তো দাঁড়াতেই হবে। সভ্যতা এগিয়ে যাবে। অশুভবুদ্ধি যতই বেড়ে উঠুক মহাকালের চক্রে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে বন্ধ্যা আঁধার। সৃজনাত্মক অন্ধকার ভেদ করে উদ্ভাসিত আলো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। জারি থাকবে শুভ সমাচার, সৃজনের আনন্দ। 'অশ্বচরিত' উপন্যাসের শেষের দিকে সেই আশাবাদের কথাও অভিব্যক্ত হয়েছে। কুন্তীর মা আবার গর্ভবতী হয়। ভানু দেখে: "ভরা পেটে বসে আছে উঠোনে। তারার আলোয় তার মুখখানি সহাস্য।"[৩৯] অন্যদিকে ধর্ষিতা সুভদ্রা, স্বামী পরিত্যক্তা সুভদ্রা শ্রীপতির নাগপাশে আর পড়তে চায়নি; সম্মান বজায় রাখতে নিশ্চিত কাজ ছেড়ে চলে যায়। মদরঞ্জিওয়ালা কোকিলা যাকে করায়ত্ত করতে চেয়েছিল শ্রীপতি, সেও শিল্পের তাগিদেই মাদুর গোটাতে গোটাতে প্রয়োগ করে প্রত্যাখ্যানের ভাষা, যে ভাষার মধ্যে সংযুক্ত ও আভাসিত থাকে স্বাধীনতার বলিষ্ঠ ধ্বনি:

> "ঠিক আছে এটি লিয়ে তুমার গৌরদাদা হাটে হাটে ঘুরবে, না বিকোক, লকে তো জানবে কেন পলাইছিল পংখিরাজ।"[৪০]

উপন্যাসের সামগ্রিক পাঠে আমাদের অন্তরে ক্ষোভ-বিক্ষোভ ভেদ করে অনুরণিত হতে থাকে এগিয়ে চলার চিরন্তন মন্ত্র:

> "চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদম্বরম্।
> সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্। চরৈবেতি চরৈবেতি।।"[৪১]

তথ্যসূত্র:

১। রায়, কালিদাস। 'ছাত্রধারা' কবিতা। https://www.milansagar.com/kobi/kalidas_roy/kobi-kalidasroy_kobita.html

২। Zamora, Lois Parkinson, and Wendy B. Faris. "Introduction: Daiquiri Birds and Flaubertian Parrot(ie)s." *Magical Realism: Theory, History, Community*, edited with an introduction by the authors, Duke University Press, 4th printing, 2003, p. 6.

৩। Dombroski, Robert. The Rise and Fall of Facism. Edited: Peter Brand and Lino Pertile, The Cambridge History of Italian Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, P. 522.

৪। Ibid, P. 522.

৫। মিত্র, অমর। অশ্বচরিত। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯, পৃ. ১৬৬।

৬। তদেব, পৃ. ১০৭।

৭। তদেব, পৃ. ১৬৩।

৮। তদেব, পৃ. ৬০।

৯। Baldick, Charis. The Oxford Dictionary of Literary Terms. New York, The Oxford University Press, 2008, P. 125

১০। মিত্র, অমর। অশ্বচরিত। প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

১১। তদেব, পৃ. ২৫৬।

১২। তদেব, পৃ. ১৪১।

১৩। তদেব, পৃ. ৪৫।
১৪। তদেব, পৃ. ২৫৩।
১৫। তদেব, পৃ. ২৭০।
১৬। Cooper, Brenda. Magical Realism in West African Fiction: Seeing with a Third Eye. London, Routledge, 1998, P. 33.
১৭। মিত্র, অমর, অশ্বচরিত। প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
১৮। তদেব, পৃ. ১২১।
১৯। তদেব, পৃ. ১৬৮।
২০। তদেব, পৃ. ১৮১।
২১। তদেব, পৃ. ২৭৭।
২২। তদেব, পৃ. ২১৭।
২৩। তদেব, পৃ. ২৯২।
২৪। Zamora, Lois Parkinson & Faris, Wendy B. Magical Realism: Theory, History, Community. USA, Duke University Press, 1995, P. 18.
২৫। মল্লিক, দীপঙ্কর ও মল্লিক দেবারতি, অমর মিত্র: সৃষ্টির স্বরলিপি, দিয়া পাবলিকেশন, সেপ্টেম্বর ২০১৪, কলকাতা-৯, পৃ. ৩২৬।
২৬। মিত্র, অমর। অশ্বচরিত। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯, পেজ-ভার্সো।
২৭। তদেব, পেজ ভার্সো।
২৮। তদেব, পৃ. ৩০৩।
২৯। তদেব, পৃ. ১০৭।
৩০। তদেব, পৃ. ৮১।
৩১। তদেব, পৃ. ৯৪।
৩২। তদেব, পৃ. ১০৩।
৩৩। তদেব, পৃ. ১০০।
৩৪। তদেব, পৃ. ১৬২।
৩৫। সিংহ, পুরুষোত্তম ও মাহাতো, জীতেন। কথাবয়ন। কথাসাহিত্যিক অমর মিত্র সংখ্যা, ২০১৭, পৃ. ২০০।
৩৬। মিত্র, অমর। অশ্বচরিত। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা বইমেলা ১৯৯৯, পৃ. ৩০৩।
৩৭। তদেব, পৃ. ৩০৪।
৩৮। তদেব, পৃ. ৩০৪।
৩৯। তদেব, পৃ. ২৯৪।
৪০। তদেব, পৃ. ২৯২।
৪১। চক্রবর্তী, জাহ্নবীকুমার। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার। ডি এম লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৯।